ওষুধ, ওষুধের দাম, চিকিৎসা ও অসুখীমানুষ

উত্তান বন্দোপাধ্যায়

চিকিৎসা - নৈতিকতা অনৈতিকতা - অনাচার

চিকিৎসা সংকটের আলাদা কোন আকাশ নেই। আর এই সংকটটাও অতীব জটিল, অমানবিক। যেন বেঁচে থাকাটাই এখন এক যন্ত্রণা হয়ে আছে। বর্তমানের বিশ্বায়ণ বা ভূবনীধারণা কতগুলো আগেকার বোধকে আমূল বদলে দিয়েছে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ দায়কে এখন অস্বীকার করা হচ্ছে। পরিবর্তে বাজার নির্ভর অর্থনীতি রাষ্ট্র ব্যবস্থার নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি আজ নাগরিকদের কাছে বর্ষিত হয়েছে - পাওয়া গেছে অনাবশ্যক ঝুঁকি আর অনিরাপত্তার জীবন, জীবিকা, বাঁচা আর মরা। মানুষের অন্যান্য প্রয়োজনের সঙ্গে চিকিৎসার উপযুক্ত সুযোগ যে আবশ্যিক অঙ্গ আজ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এটাতো গেল একটা দিক, সবচেয়ে মজা হলো যে পুঁজি এক্ষেত্রে এমন অমানবিক যে বড়োলোকতান্ত্রিকতাও সে ভুলে যায়। চিকিৎসা সংকটে পড়ে বড়োলোকেরাও, তখনই সে অসহায় - সে গরীরবই হোক আর বড়লোকই হোক - যখন সে রোগী বা অসুস্থ। চিকিৎসা ক্ষেত্রে পুঁজির মুনাফা যখন বাড়ে সে তখন রোগীটির অর্থনৈতিক অবস্থান ভুলে যায় বা কেয়ার করে না। তাইচিকিৎসায় অনাচার বড়লোকেরও হয়। কিন্তু জ্ঞানতত্ত্বের মজটাটা হলো ডাক্তারবাবু তো আর ভুল চিকিৎসা করেন নি কারণ তিনি যে চিকি ৎসাটা করেছেন তা তথ্য নির্ভর চিকিৎসা বা এভিডেন্স বেসড্ মেডিসিন (ই. বি. এম) অর্থাৎ 'বিজ্ঞান'। একটা ক্ষমতার খেলা বা ক্ষমতার আড়ালে 'বিজ্ঞান' নাম নিয়ে একটা খেলা। কিন্তু ম্যাজিকটা এখানেই যে এতদসত্ত্বেও প্রথম এ প্রশ্নটা সোজাসুজি এসে দাঁড়িয়েছে, যে চিকিৎসার অনাচারের পিছনে যদি ব্যবসার অনৈতিকতা কিছু থেকেও থাকে তবু বিজ্ঞান কি সবসময় নৈতিকতা মেনে হয়? সে কি নিরপেক্ষ? চিকিৎসা বিজ্ঞান বনাম নৈতিকতার ভিতরেই লুকিয়ে আছে চিকিৎসা শাস্ত্রের সংকট। সবচেয়ে বড়ো কথা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে বলা হয় ইনএক্স্যাক্ট সায়েন্স। এখানে দুই-এ দুই-এ চার হয় না। লজিকটাইইনএক্স্যাক্টনেস। আর তাই, ডাক্তার ভুল করলেও ভুল ধরিয়ে দেবার রাস্তার থেকে ডাক্তারের অব্যাহতির রাস্তাটা অনেক বড়ো। ডাক্তারদের রেগুলেট করার আইনগুলো পড়লেও বোঝা যায় যে চিকিৎসককে অভিযুক্ত করার রাস্তা খুব কম আর রাস্তা থাকলেও তা প্রমাণ করা খুবই দুঃসাধ্য। তারা যেটা করেন সবক্ষেত্রেই তার যুক্তি হলো তারা তো বিজ্ঞানটাকেই ব্যবহার করছেন।

চিকিৎসায় দুর্বৃত্তায়ণ - উদাহরণ

আজকের চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে ওষুধ-বিষুধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা -নির্ণয়, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম এবং সরকারী বেসরকারী হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের খরচ খরচা সব কিছু যোগ হয়ে চিকিৎসা খাতে খরচের মাত্রা শতকরা ৭০ জন মানুষের আয়ত্ত্বের বাইরে চলে গেছে। যাদের আয়ত্ত্বের মধ্যে আছে তাদের বহু আড়ম্বরে চিকিৎসা দিতে হয় নার্সিংহোমের লাভ তোলার জন্য। তাই যেটা দরকার নেই সেটা করতে হয়। আর লজিকও তৈরী করতে হয়। ধরা যাক্, পায়ের আঙুল ভেঙেছে। মেডিক্লেম আছে ৫ লক্ষ টাকার। এখন যদি ৫ লাখ টাকাটাকে খরচ দেখাতে হয় তাহলে লজিক তৈরী করতে হবে। ICCU তে পাঠাতে হবে। ভোভেরান ইঞ্জেকশন আই . ভি. দিতে হবে (ধরা যাক)। র‍্যানট্যাক দিতে হবে না একবেলা, এপিগ্যাসট্রিক পেইন হবে - আরজেন্ট ই. সি. জি হলো- খারাপ, অ্যাঞ্জিওগ্রাম - খুব খারাপ। ব্লকেজ। পি. টি. সি. এ. বা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ। এরকম শয়ে শয়ে গল্প আছে। অপারেশন টেবিলে ধেড়িয়ে দিয়ে বেড হেড টিকিট (BHT) - এ নানারকম ভাবে ডক্টরিং করারও নমুনা আছে। চিকিৎসার অনাচার আর গাফিলতি আলাদা দুটো কথা। গাফিলতি আগেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আমেরিকাতেও আছে, সুইডেনেও আছে, ইংল্যান্ডেও আছে, রাশিয়া, চীন, কোরিয়া সর্বত্রই আছে। যেমন ধরা যাক মিস্ম্যাচড্ ট্রান্সফিউশন — এটি হচ্ছে এক গ্রুপের রক্তের বদলে অন্য গ্রুপের রক্ত যদি শরীরের অভ্যন্তরে ঢুকে যায় তাতে যে শারীরিক

ক্ষয় ক্ষতি বা ব্যাধি হয় তাকেই বলা হয়। এটি গাফিলতি। এটির কথা হ্যারিসন, ডেভিডসনের বইতেও লেখা আছে। কিন্তু অনাচার? অনাচারের পিছনে অশুভ ব্যবসা জড়িত। মুনাফা জড়িত। দুর্বৃত্তায়ণ জড়িত। ল্যাপারোস্কপিক কোলেসিস্টেকটোমিতে বা ল্যাপকোলিতে (যদি গলস্টোন হয় বা কোন কারণে গলব্লাডার বাদ দিতে হয়) গলব্লাডার বাদ দেবার পরে কমন হেপাটিক ডাক ট্-এর কাছে আড়াআড়ি ভাবে ক্লিপিং করার বদলে যদি মাঝখানে ক্লিপিং করা হয় তাহলে পিত্ত আর আসবেই না। অবস্ট্রাকটিভ্ জন্ডিস হয়ে রোগী মারাও যেতে পারে যদি না পেট কেটে ল্যাপারোটমি বা ওপেন অপারেশন করা হয় সাথে সাথেই। কিন্তু ডাক্তারবাবু তো ল্যাপারোস্কোপিক সার্জেন, পুরো পেটকাটার সার্জেন নন বা অভ্যেস নেই। আবার ডাক্তার অন্য কোন 'ওপেন' সার্জেন কে ডেকেও আনতে চাইছেন না কারণ তার ধ্যাড়ানোটা যদি ধরা পড়ে যায় অন্য বিশেষজ্ঞের কাছে! সে ডাকলোও না চেপে গেলো - বি. এইচ. টি. তে উল্টোপাল্টা লিখলো। কমপ্লিকেশন বাড়তে থাকলো। রোগী কয়েকমাস ভুগলো। অবশেষে মারা গেল। ধার দেনা বাড়ী ঘর বিক্রি করে খরচা হলো সাত লক্ষ। বলা বাহুল্য নার্সিংহোম ও ডাক্তার পুরো টাকাটা নিয়ে নিলো। এটা নাকি তাদের প্রাপ্য। এটা গল্প নয়। যদিও সবক্ষেত্রেই এটা হয় - বলা যায় না, তবে এঘটনা বিরল নয়। চিকিৎসা এখন এইভাবে ক্রিমিনালিটির আওতায় চলে গিয়েছে। রোগীরা যে খরচা করেন তার যৌক্তিকতা কতটা? কতটা আবশ্যিক বা অনাবশ্যিক? এছাড়া ওষুধের জগত তো আছেই। ওষুধের ট্রায়াল চলাকালীন ওষুধের পরীক্ষা করা, রোগীকে না জানিয়ে-এ আখছার আমাদের দেশে হয়ে চলেছে। প্রচুর কম্বিনেশন ড্রাগ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে - ডাক্তারেরাও লিখছেন।

আমাদের দেশে ওষুধের দামের ব্যবস্থা - সরকারের ভূমিকা

প্রয়োজনীয় ওষুধের ক্ষেত্রে দাম হচ্ছে সবচেয়ে প্রতিবন্ধক আমাদের দেশে। কারণ, রোগের চিকিৎসায় ওষুধ ও রোগ নিরূপণের পরীক্ষার জন্য খরচ সবচেয়ে বেশী করতে হয়। ব্যক্তিমালিকানাধীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষ সবার উপরে। এদেশে সরকার (সরকারী সমীক্ষা অনুযায়ী) মানুষের মোট চিকিৎসার ১৭ শতাংশ বহন করে আর ৮৩ শতাংশ বহন করে মানুষ নিজে। রোগীর জীবন বাঁচাবার জন্য মানুষ মরীয়া হয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়, এ উদাহরণ প্রচুর। আবার, অসংখ্য মানুষ আছেন যারা অচিকিৎসিত-ই থাকেন কারণ তারা ওষুধ কিনতে পারেন না। এরকম একটা অবস্থায় আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে ওষুধের দাম নিয়ে আলোচনা করতে পারি। শোনা গেছে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাতেই ২০০৪ সালের সমীক্ষায় ধরা পড়েছে যে আমাদের দেশের মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ মানুষ আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহার করেন। যাইহোক, পেট্রল - ডিজেলের দামের মতন জানিয়ে বাড়েনা ওষুধের দাম। ওষুধের দাম নিঃশব্দে বেড়ে যায়। কিন্তু মানুষকে তো ওষুধ কিনতেই হবে। এটাও জানা গেছে যে ধনী দেশগুলি যেমন অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, আমেরিকা, ইউরোপ, জাপানে তাদের সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের দেশে জোরালো সেরকম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই।

ওষুধের দাম ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৭৮ সালে সরকার হাতি কমিশন সুপারিশ করে এবং প্রথম জাতীয় ওষুধ নীতি গৃহীত হয়। ১৯৭৯ সালে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ জারি হয়। মোট ৩৮৭ টি ওষুধের প্রয়োজনীয় ওষুধ হিসাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর একটু আগের ইতিহাস ছিল অন্যরকম। ১৯৭০ সালের আগে মূলতঃ গ্লাক্সো, হেক্সট্, এম এস ডি, স্কুইড এই সমস্ত বিদেশী কোম্পানীর হাতেই ছিল ওষুধের গোটা বাণিজ্য। ১৯৭০ সাল থেকে তৈরী হলো প্রসেস পেটেন্ট ব্যবস্থা। '৭০ সালের পরে ধীরে ধীরে তৈরী হলো আইডি পি এল বা হিন্দুস্তান এ্যান্টিবায়োটিকস্ লিমিটেড। তারা বাল্কড্রাগ এবং মূলতঃ এ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন করতে শুরু করল। এবং এই মৌল ওষুধগুলো রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসেস এর নামে প্র্যাকটিক্যালি কারিগরিকে 'টুকলি' করে তার মাধ্যমে অর্থাৎ অন্যরকম উপায়ে ওই মৌলটিকেই উৎপাদন করার মাধ্যমে মৌল ওষুধ তৈরী করে অন্যান্য ওষুধের কোম্পানীকেও বিক্রি করতে শুরু করে দিল। তারপরেই আস্তে আস্তে ১৯৭৮ সালে হাতি কমিশনের রিপোর্ট এবং প্রথম ওষুধ নীতি। যাই হোক তাহলে দেখা যাচ্ছে যে

৩৮৭ টি ওষুধ প্রথম ১৯৭৯ সালে মূল্য নিয়ন্ত্রণে আনা হয় অর্থাৎ সরকারের বেঁধে দেওয়া দামের বেশী দামে ওই ওষুধগুলো আর বিক্রি করা যাবে না।

ফর্মূলা, আইনের সুযোগে ভুজুং ভাজুং

সেইসময় ওষুধের দামের জন্য একটা সূত্র তৈরী করা হয়। সেটি হলো

ওষুধের খুচরো মূল্য = (কাঁচা মালের মূল্য + প্যাকিং এর মালের মূল্য + প্যাকিং এর খরচের মূল্য + উৎপাদন প্রক্রিয়ার খরচের মূল্য) X $(১ + \frac{\text{লাভের মাত্রা}}{১০০})$ + উৎপাদন কর।

এই ফর্মুলাটা আজও চলছে। ধাপে ধাপে সরকার ৩৮৭টি ওষুধকে কমাতে কমাতে ১৯৯৫ সালে মাত্র ৭৪টি ওষুধের ক্ষেত্রে দামের নিয়ন্ত্রণ রেখে এবং লাভের মাত্রা ১০০ শতাংশ করা হয়েছে। তার মানে এই সূত্রটি প্রয়োগ করে উৎপাদন মূল্যের দ্বিগুণ মূল্য ওষুধের দাম ধার্য করা যাবে। এতো বেশিহারে লাভের অনুমতি কিন্তু অন্য কোন দেশে দেওয়া হয় না, বিশেষত মূল্য নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রে। এখনও আমাদের দেশে ওই একই সংখ্যায় অর্থাৎ ৭৪টি ওষুধই কনট্রোলড প্রাইসে বা মূল্যে নিয়ন্ত্রণাধীন। ২০০৪ সালে ডব্লু. টি. ও-র প্রেসক্রিপশনে আবার শুরু হলো প্রডাক্ট পেটেন্ট ব্যবস্থা। বেড়ে গেলো ওষুধের দাম হু হু করে। নিয়ন্ত্রিত ওষুধের দামগুলোর ক্ষেত্রেও কোম্পানীগুলো নিজেদের ইচ্ছে মতন দাম ধার্য্য করছেন। কিভাবে? যে মৌলটি যে বেস্-এ থাকলে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব সেই মৌলটি সেই বেস্-এ না রেখে বেস্ পাল্টিয়ে ড্রাগ এ্যান্ড কসমেটিকস্ অ্যাক্ট অনুযায়ী বেস-টিকে ওষুধ না বানিয়ে (মৌলটি একই রেখে) ফুড-সাপ্লিমেন্ট বানিয়ে অর্থাৎ কারিগরী ভুজুং ভাজুং দিয়ে দামটাকে বাড়িয়ে দেওয়া। অনেক কোম্পানী ইদানিং এইচ টু ব্লকার ফেমোটিডিন কে ট্যাবলেট আকারে না রেখে জেল আকারে বিক্রি করছে। ফলে নিয়ন্ত্রণ নেই, জেল আকারে বিক্রি করলে। তখন এটা 'ওষুধ' থাকছে না - হয়ে যাচ্ছে ফুড সাপ্লিমেন্ট। দামের নিয়ন্ত্রণ রাখতে হলো না। একটা ফেমোটিডিন ৪০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেটের দাম যদি ৪০ পয়সা হয় ওটার অনুরূপ ১০ এম-এল জেলের দাম হয় তার ১০গুণ বেশী অথচ উৎপাদন খরচ প্রায় একই। ১৯৭০ দশকের আগে ছিল বিদেশী কোম্পানীদের হাতে ওষুধের বাজার। বর্তমানে বেশ কিছু দেশীয় পুঁজিপতি চুটিয়ে টেক্কা দিচ্ছে বিদেশী কোম্পানীদের সাথে। তারমধ্যে অন্যতম হলো সান ফার্মাসিউটিক্যালস্। ৮০ দশকের প্রথমে সান ছিল একজন ডিসট্রিবিউটর। কলকাতার ব্যবসায়ী। বর্তমানে সানের মোট পুঁজি প্রায় আঠার হাজার কোটি টাকা। এম. আই. এম. এস্ নামে একটি সমস্ত ওষুধের পঞ্জিকার সম্পাদক ডাঃ মোহন গুলাটি সম্প্রতি একটি সভায় একথা বলেছিলেন। সত্তর দশকে কেউ কেউ রাজপথে দুধ বেচতো এখন সে ওষুধ কোম্পানীর মালিক। তার পুঁজি প্রায় হাজার কোটি টাকার উপর, কি করে হয়? কেমন ভাবে হলো? নিশ্চই ওষুধের মুনাফা করে। কি লাভ হলো তাহলে দামের নিয়ন্ত্রণ করে? যদিও নিয়ন্ত্রিত মৌল ওষুধ মাত্র ৭৪ টি, এখনও। মোটামুটি ৭০০ টির মত মূল ওষুধ দিয়ে এদেশের অধিকংশ ওষুধ তৈরী হয়। সুতরাং বিপুল সংখ্যক ওষুধ মূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেক্ষেত্রে দামের কোন সীমা নেই। আমরা এফ. এম. আর. এ. আই এর কাছ থেকে যে তালিকা সংগ্রহ করি তার অংশ একটু তুলে ধরতে চাই যে নিয়ন্ত্রিত ওষুধের মূল্য বেড়েছে কিভাবে —

ওষুধের নাম	কি ধরনের ওষুধ	প্যাক	১৯৯৮ সাল দাম	২০০৭ দাম	বৃদ্ধিশতাংশে
১। আরসেনিক্স জেড	টিউবারকুলোসিস-এর ওষুধ	১০টির ট্যাব	৭.৭৮	৫১.৫৪	৫৬৬.৪৫
২।হিউম্যান অ্যাক্টোপিড	ইনসুলিন	১০ মিলি ইঞ্জে	১৭৬.৮০	৫০৬.১৫	১৮৬.২৮
৩। ওভরাল - এল	জন্ম নিয়ন্ত্রণের	২১ টির ট্যাব	১৪.২০	৬১.৯৫	৩৬৬.২৭
৪। এনাম	হৃদরোগের	২.৫ মিঃগ্রাম১০টি	৮.১১	১৭.৩৩	১১৩.৬৯
৫। মেবেক্স	কৃমির জন্য	১০০ মিলিগ্রা ৬টি	৮.৯০	১৬.০০	৭৯.৭৮
৬। ফিফল	রক্তাল্পতার	১৫টি	১৪.৮৬	৩৫.২১	১৩৬.৯৪

(টাকার অবমূল্যায়নের ব্যাপারটিকে 'চল'রাশি ধরেও বাল্ক ড্রাগের দাম কমেছিল বাজেটে।)

অথচ নিয়ন্ত্রিত ওষুধের দাম বাড়ার কথাই নয় বরং কমার কথা। বিশ্বের বাজারে চীন যবে থেকে মৌল ওষুধগুলি, যা থেকে ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, সিরাপ, ইঞ্জেকশন তৈরী হয়, বৃহদাকারে রপ্তানি করতে শুরু করে বিশ্বের বাজারে তখন থেকেই দাম পড়তে শুরু করে। আমাদের দেশেও বহু মৌল ওষুধ উৎপাদন করা হয়। সরকার যে সমস্ত মৌল ওষুধের (৭৪টি) মূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন তা ধার্য্য দামের চেয়ে অনেক কম দামে মৌল ওষুধ খোলা বাজারে পাওয়া যায়। তা স্বত্ত্বেও নিয়ন্ত্রত ওষুধের মূল্য বাড়ে কি করে? এটা একটা মূল্য নিরূপণে প্রতারণা।

ওষুধ মুনাফায় নানান ধাঁচে হোয়াইটকলারড্ দুর্বৃত্তায়ণ

যেগুলো অনিয়ন্ত্রিত মূল্যের ওষুধ সেগুলো যে প্রয়োজনীয় ওষুধ নয় তা কিন্তু নয়। ফলে একই ওষুধ বিভিন্ন দামে যে যা পারছে এক অভব্য মুনাফাবাজদের নৈরাজ্য সৃষ্টি হচ্ছে। এবার আলোচনা করা যাক কিভাবে হোয়াইট্কলারড্ দুর্বৃত্তায়ণ ঘটে যায় ওষুধের দাম নিয়ে। একই ওষুধের বিভিন্ন দাম হয় কিন্তু বিশাল পার্থক্য হয় কি ভাবে? একই ওষুধ বিভিন্ন ব্রান্ড নামে বিভিন্ন কোম্পানী বিক্রি করে। সর্বনিম্ন মূল্যের ওষুধে যিনি বিক্রি করছেন তিনিও লাভ করছেন, তাহলে সর্ব্বোচ্চ মূল্যের ব্রান্ডটির দাম এতো বেশী হয় কিভাবে? উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। 'রেস্পেরিডোল' এটি ট্যাবলেট টরেন্ট কোম্পানী বিক্রি করে ১টাকা ৬৯ পয়সায়। এথনর একটি ট্যাবলেটের দাম নেয় ২৭ টাকা ৩০ পয়সা। দামের পার্থক্য শতাংশ কত? ১৪৯৭.৬৩ শতাংশ। অ্যামলোডিপিন উচ্চরক্তচাপ বৃদ্ধিকে প্রশমিত করে। ম্যানকাইন্ডের ১০টা ট্যাবলেটের দাম চার টাকা আর ফাইজার কোম্পানী একই ওষুধ ৬৬ টাকা ৯৬ পয়সা। সেট্রিজিন (১০ মিলিগ্রা) একটি অ্যালার্জি প্রশমন করার ওষুধ। মেডলে কোম্পানীর ১০ টি ট্যাবলেটের দাম ১০ টাকা, গ্লাক্সোর ৩৩ টাকা ৬৫ পয়সা। একটি অ্যান্টিবায়োটিক লিভোফ্লক্সাসিন। সিপলা কোম্পানীর ১টি ট্যাবলেটের দাম ৬ টাকা ৮২ পয়সা, অ্যাভেন্টিস কোম্পানীর দাম ৯৫ টাকা।

এফিকেসি? নাকি... আরেকটা 'ঠুলি' ! তাহলে কি জেনেরিক? .....ওষুধের ডিসট্রিবিউশন সার্কিট

এ ধরনের অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু বিপণন কর্মীদের শিখিয়ে দেওয়া হয় যে ডাক্তারদের কাছে গিয়ে দামী ওষুধটি (অন্যান্য কোম্পানীর ওষুধের তুলনায়) প্রমোশন করতে গিয়ে যেন বলে- রিসার্চ প্রডাক্ট এটি। মানে, যেন প্রথম বাজারে এরাই এই ওষুধটি নিয়ে এসেছিল এবং এদের ওষুধের যে প্রসেস কোয়ালিটি তার কার্যকারিতা বা এফিকেসি সবচেয়ে ভাল। এটি একটি ফালতু তত্ত্ব। ড্রাগ কন্ট্রোল জেনারেল অফ্ ইন্ডিয়া প্রত্যেকটি ওষুধের বিপননের জন্য মনোনয়ন দেয়। পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই দেয়। তাহলে? ফার্মাকো কাইনেটিক্স নাকি প্রসেস বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য অনেকটাই নির্ভর করে। উৎপাদন প্রক্রিয়া যদি একটু কমপ্রোমাইজড্ হয় তাহলে নাকি এফিকেসির এদিক ওদিক হয় কিন্তু পুরোমাত্রাতেই নাকি ওষুধটি থাকে। কোন বিজ্ঞানে একথা বলে কে জানে। যদি তা হয়ও তাহলে ডি. সি. জি. আই এইসব ওষুধগুলোকে একইসাথে অনুমোদন দেয় কি করে? তাহলে কি ওষুধকে বাজারে নামানোর জন্য ডি. সি. জি. আই এর কোন অফিসারকে ঘুষ দিতে হয়? হয়তো তাই। হয়তো তা নয়। যাইহোক এই ওষুধের ধরণের দামের ফারাকের অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। অদ্ভুত ব্যাপার, যে সব ওষুধ সবচেয়ে বেশী চলে তার দাম সর্বাধিক। আরো অদ্ভুত ব্যাপার- তা সত্ত্বেও সরকার সর্বাধিক প্রচলিত ওষুধের দামকে দৃষ্টান্ত রেখে অন্য ব্রান্ডের ওষুধের মূল্য নিরুপণ করেন। ওষুধের দাম নিয়ে প্রচুর কথা বলা যায়। যে ব্রান্ড সবচেয়ে কমদামে যে কোম্পানীটি বিক্রি করে সেটা কি কমদামী কোম্পানী? মোটেই না। ধরা যাক ম্যানকাইন্ড কোম্পানী প্রথম ১৫টা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর একটা। জার্মান মেডিকোস কোম্পানীও সস্তায় বহু ওষুধ বিক্রি করে। এদের বিভিন্ন ধরনের মার্কেটিং পলিসি। ডিসট্রিবিউটারদের একরকম কমিশন দেয়, রিটেলারদের আরেকরকম কমিশন। ডাক্তারদের প্রমোশনের জন্য নানান ধরনের উপঢৌকনের ব্যবস্থা থাকে। ব্যবস্থা থাকে তাদের বিদেশ ভ্রমণের। সবটাই কোম্পানী গুলো তুলে নেয় সাধারণ মানুষের পকেট কেটে। এ্যমলোকাইন্ড ওষুধটি কম দামী স্ট্যামলোর থেকে। এমলোকাইন্ড কমদামে ছেড়ে বেশী বিক্রি করতে চায় — অনেক বেশী। যাতে অনেক বড়ো বাজারটা পাওয়া যায়। স্ট্যামলোর বাজারও ভাল, কাজেই ডাক্তারদের হাত করাটা হলো সবচেয়ে বড়ো কাজ। এনিয়ে প্রচুর নোংরামি

চলে। ধরে নিই আরেকটি 'ইনজেক্টেবেল অ্যান্টিবায়োটিক 'সেরোপোনেম' নামে ওষুধটির কথা। অনেক কোম্পানী 'সেরোপোনেম' বিক্রি করে একটি ভায়াল ৩৩০০ টাকায় (এম আর পি)। এই ওষুধটি মূলতঃ সেপ্টি সিমিয়া কে প্রতিহত করার ওষুধ। এই ওষুধটি ডিস্ট্রিবিউটর দের কাছে পাওয়া যায় মাত্র ১১০০ টাকায়। অনেক সহৃদয় ডাক্তারবাবু সরকারি হাসপাতালে রোগীর বাড়ীর লোকদের বলে থাকেন ওমুক ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে চলে যান — ১১০০ টাকায় এই ওষুধটি পাবেন। মার্কেটিং সার্কিটটাই এমন যে প্রচুর মানুষ তো এই দামে পাবেন না। আবার নার্সিংহোমগুলো এই ওষুধটিই ১১০০ টাকায় কিনে বিল করে ৩৩০০ টাকা, প্রতিটি ভায়াল। এইভাবে অসুস্থ একটা জগত তৈরী হয়েছে ওষুধের। ওষুধের দামের কারচুপি বন্ধ করার জন্য সরকার ব্রান্ড নাম ছাড়াও ওষুধের কেমিক্যাল নামে বা জেনেরিক বা গোত্র নামে ওষুধ বিক্রীর প্রতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে নজর দেয়। কিন্তু বাজারটা ব্রান্ড নামে ওষুধে ছেয়ে আছে - জেনেরিক ওষুধ একমাত্র হাসপাতালগুলো কেনে। সরকার কোম্পানীগুলোকে বলে জেনেরিক নামেও ওষুধ বাজারে বিক্রি করতে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। এখানেও চালাকি চলে। চলে বিরাট প্রহসন। জেনেরিক নামের ওষুধের দাম কম হয় এবং সরকারী নানাবিধ ছাড়ের ব্যবস্থা থাকে বলে সাধারণত এই সব ওষুধ সরকারী বা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গুলিতে বেশী পরিমানে (বাল্ক) কেনা হয়, এই ওষুধগুলোর তেমন প্রমোশন হয়না ডাক্তারদের কাছে। কাজেই গরীব মানুষেরা কিনতেও পারেনা কারণ ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনে তার উল্লেখ থাকে না। এই সুযোগটুকু যতটুকু আছে ততটুকুও অপব্যবহার করে ওষুধ কোম্পানীগুলো, চালু করে ব্রান্ডেড জেনেরিক ওষুধ। কি সেটা? ওষুধের প্যাকেটে জেনেরিক নাম প্রথমে লেখা থাকলেও তার একটা অন্য ব্রান্ডেড নাম দিয়ে রাখা হয়। নির্দিষ্ট কোম্পানীর ওষুধগুলো খুচরো ব্যবসায়ী বা চিকিৎসক লিখে ঐ কোম্পানীর ওষুধটাই বিক্রি হওয়া নিশ্চিত করতে পারেন। দেখা গেল এই সব ওষুধের ক্ষেত্রে কোম্পানীগুলি খুচরো দাম রাখছে খুবই বেশী কিন্তু পাইকারী দাম রাখছে অত্যন্ত কম। এর ফলে মাঝখানের ব্যবসায়ীরা প্রচুর লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু যিনি ওষুধ ব্যবহার করছেন তিনি কোন সুবিধা পাচ্ছেন না। সরকার আপত্তি তুলেছিল। তাতে ২০০৬ সালে ১১টি কোম্পানী প্রায় ৮৮৬ টি ওষুধের দাম কমিয়ে দিল। কিন্তু দেখা গেলো ওই ৮৮৬ টি ওষুধের মধ্যে মাত্র ১টি বাদ দিয়ে কোন ওষুধই বিক্রির জন্য তারা প্রচার করেন না। এগুলোর ফলে কি লাভ হলো তাদের? তারা ব্রান্ডেড ওষুধগুলোকে আলোচনার উর্দ্ধে রাখল। এন. পি. পি. এ বা ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি হলো আমাদের দেশে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করার সরকারী দপ্তরের নাম। ওষুধের কোম্পানীগুলো বিভিন্ন তথ্যের যোগান দিয়ে ওষুধের দামের অনুমোদন করিয়ে নেয় এন. পি. পি. এ-র কাছ থেকে। এন. পি. পি. এ কে নানাভাবে প্রভাবিত করে। কিভাবে? ১৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ওষুধ কোম্পানীর মালিকগোষ্ঠী এই এন. পি. পি. এ তে মেম্বার হিসাবে অংশগ্রহণ করে। ফলে এন. পি. পি. এ -কে নানা ভাবে প্রভাবিত করে ওষুধের নিয়ন্ত্রণের মূল্য প্রকৃত মূল্য থেকে বেশী করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। মৌল ওষুধগুলোর ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট পেটেন্ট ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে নানান রকম কারচুপি করার সুযোগ থাকে। তার উপর থাকে এক্সাইজ ডিউটি বা উৎপাদন কর ফাঁকি দেবার ব্যবস্থা। এক্সাইজ ডিউটি বা উৎপাদন কর ওষুধের ক্ষেত্রে ধার্য ছিল সবচেয়ে কম। অন্যান্য জিনিষের উপর যখন ছিল এক্সাইজ ডিউটি ১৬ শতাংশ তখন ওষুধের উপর ছিল মাত্র ৮ শতাংশ। মাঝখানে বেড়ে ১৬ শতাংশ হয়ে যায়। ইদানিং আবার ৮ শতাংশ। কিছু কিছু রাজ্যের এস. ই. জেড শিল্পতালুকে এক্সাইজ ডিউটি নেই। আবার ওই ওষুধটিই একই কোম্পানী অন্য কোন ছোট অনুসারী কারখানায় অন্য কোন জায়গায়, যেখানে এস. ই. জেড নেই, বানিয়ে নিজেরা প্যাকেজিং করে পুরো এক্সাইজ ডিউটি দেয়। অনুসারী কোন ছোট কারখানাকে দিয়ে ওষুধটা বানিয়ে নিলে উৎপাদন খরচ কম পড়বে; আর উৎপাদন খরচ কম পড়লে উৎপাদন কর ও কম থাকবে। কিন্তু ওই প্রোডাক্টটাতো একটা জায়গায় তৈরী হয় না। ধরা যাক তিনটে জায়গায় তৈরী হয়। ধরা যাক প্রোডাক্টটার মোট উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশ কোন 'A' নামক ছোট কারখানাকে দিয়ে তৈরী করা হয়, যেখানে একটা এক্সাইজ ডিউটি আছে। ৫ শতাংশ আরেকটা 'B' নামক জায়গা থেকে তৈরী হয় যেটা আরেকটা অনুসারী কারখানা। এখানে উৎপাদনের খরচ একটু বেশী দেখানো হয় — তাই

এক্সাইজ ডিউটি একটু বেশী। বাদবাকী ৮৫ শতাংশ তৈরী হয় ধরা যাক উত্তরাখন্ড বা হিমাচল প্রদেশের কোন একটি কারখানা 'C' নামক জায়গা থেকে, সেটি এস. ই. জেড অঞ্চল এবং এখানে উৎপাদন কর বা এক্সাইজ ডিউটি নেই। কিন্তু তা বলে এই প্রোডাক্টটি উৎপাদনকরহীন ভাবে বিক্রি হয় না। এই ওষুধটির ১০০ শতাংশকেই উৎপাদন করের হিসেবে ধরা হয়ে থাকে এবং 'B' নামক জায়গায় ওষুধের মূল্য যেহেতু বেশী — সেটাকেই প্রোডাক্টটার ধার্য দাম বলে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ প্রায় ৮৫ শতাংশ এক্সাইজ ডিউটি না থাকলেও সেটা নেওয়া হয়, আর সরকারের খাতে সেটা জমা পড়ে না — পুরোটাই কোম্পানী আত্মসাৎ করে। অর্থাৎ কর তুলেও সরকারের কাছে কর না দেওয়া, উল্টে কোম্পানীর মুনাফার জন্য সাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করার ব্যবস্থা। এই চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে - নেই কোন নতুন ওষুধনীতি। ১৯৯৬ সালের পর আর নতুনভাবে কোন ওষুধনীতির পরিবর্তন হয়নি। ৭৪টি নয় — নিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিত ৩৯৫ টারও বেশী ওষুধের। আর তাছাড়া জেনেরিক ওষুধের বাতাবরণ না তৈরী করে জেনেরিক বিক্রি করা মানে ওটা আরেকটা ফাঁকি। একান্ত প্রয়োজনীয় ওষুধ, অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বা মিশ্রিত ওষুধ এগুলো নিয়েও প্রচুর জল্পনা কল্পনা চলে — কিন্তু ব্যাপারটা বোঝে কজন বা এর জন্য আন্দোলনও তেমন হয় না — ফলে পুরোটাই সরকার আর ওষুধ কোম্পানীর লুকোচুরি খেলার মধ্যে জনগণকে ঠুলি পরানো।

এর থেকে মুক্তি কিভাবে? জানিনা — অন্তত আলোচনা চালু থাক। সকলে কি বলছে এটা যাতে জানতে পারি সেই উদ্যোগটুকুই আজকে আশু হয়ে থাকুক।

এখানেও যে গল্পটা আলাদা কিছু নয়, তার নির্দিষ্ট কিছু হদিস পাওয়া গেল ৯ই জানুয়ারী-এ আনন্দবাজারে প্রকাশিত ''ওষুধ-সংস্থার খরচে ডাক্তারদের বাইরে যাওয়া, উঠছে প্রশ্ন'' শীর্ষক সোমা মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদনে।

---

*আমেরিকাতে সম্প্রতি ওষুধ কোম্পানীদের সঙ্গে, ডাক্তারদের সম্পর্ক নিয়ে বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলিতে ধরা পড়েছে এই সম্পর্কের নানা কলুষিত দিক। কোথাও ডাক্তারদের সরাসরী টাকা দিচ্ছে কোম্পানীগুলি, কোথাও সরকারী শীর্ষ সংস্থা ফেডারেল ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশান (**FDA**) অনুমোদিত ওষুধে বাজারে বিক্রির নানা কৌশল নেওয়া হচ্ছে। ডাক্তারদের হাত করে। মার্সিয়া অ্যাঞ্জেল তাঁর পুস্তক পর্যালোচনার প্রবন্ধে এরকম হরেক কেলেঙ্কারির কথা তুলে ধরেছেন, যেগুলো বিভিন্ন বইতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন, ''ওষুধ কোম্পানীগুলি এখন একটি অত্যন্ত কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করছে - রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধের প্রচার না করে তারা (ডাক্তারদের সাহায্য) রোগের প্রচারে নেমে পড়ছে, তাদের কোম্পানীর ওষুধকে বাজারে খাওয়াবার জন্য। যে কেউ নীচের ওয়েবসাইট থেকে প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন। পেতে পারেন আরও বিস্তৃত তথ্যের উৎসের (বইগুলির) হদিস।*

Drug Companies & Doctors : A Story of Corruption - Marcia Angell -New York Review of Books, Vol. 56, No. 1 (Jan 15, 2009) [http://www.nybooks.com/articles/22237] (সৌজন্য ঃ সুদীপ্ত সরস্বতী)